Islamic Online Madrasah-IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়ন

তত্ত্বাবধায়নেঃ
মাওঃ মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
সাবিনা ইয়াসমিন
২১৬০২০৭৩

তারিখঃ ৩১ মে, ২০২৪

Islamic Online Madrasah-IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়ন

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট

তত্ত্বাবধায়নেঃ
মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
সাবিনা ইয়াসমিন
২১৬০২০৭৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah - IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়ন" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিনা ইয়াসমিন, আইডিঃ ২১৬০২০৭৩ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়ন" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

সাবিনা ইয়াসমিন

আইডিঃ২১৬০২০৭৩
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ
৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকাঃ ৩

শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের অবস্থান : ৪

ইসলামে নারী শিক্ষাঃ.. ৪

হিন্দু ধর্মে নারী শিক্ষাঃ...৫

নারীদের সম্পত্তির অধিকারঃ ৬

ইসলামে নারীর সম্পত্তির অধিকারঃ..৬

হিন্দু ধর্মে সম্পত্তির অধিকারঃ ৯

বিবাহের ব্যাপারে দুই ধর্মের অভিমতঃ ১১

ইসলাম ধর্মে বিবাহঃ..১১

হিন্দু ধর্মে বিবাহঃ ১২

যৌতুক বা মোহরানা নিয়ে দুই ধর্মের মতামতঃ..................................১৬

ইসলামী মোহরানা পদ্ধতি..১৬

হিন্দু ধর্মের যৌতুক প্রথাঃ..১৭

বিধবা বিবাহের ব্যাপারে দুই ধর্মের মতামতঃ...................................১৮

ইসলাম ধর্মে বিধবা বিবাহঃ...১৮

হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহঃ ২০

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে দুই ধর্মের বিধানসমূহঃ ২১

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে ইসলামের কথাঃ.. ২১

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে হিন্দু ধর্মের কথাঃ ২২

নারীর পর্দাঃ ২৩

নারীর পর্দা নিয়ে ইসলামের নির্দেশনাঃ ২৩

হিন্দু ধর্মে নারীর পর্দাঃ ৩০

মায়ের মর্যাদা নিয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মতামত ৩২

উপসংহারঃ ৩৩

তথ্যসূত্রঃ ৩৪

প্রারম্ভিকাঃ

মহান আল্লাহ সুবহানাতায়ালা অপূর্ব সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে অপরূপ সৃষ্টি হচ্ছে নারী। সৃষ্টিকর্তা নারীকে তার নিপুণ কাজে অত্যন্ত যত্ন করে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকে যত ধর্ম এই পর্যন্ত পৃথিবীতে এসেছে সব ধর্মেই নারীর অধিকারের কথা নারীর মূল্যায়নের কথা কিছু না কিছু হলেও বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের আগে কোন ধর্মই পরিপূর্ণভাবে নারীর মূল্যায়ন ও মর্যাদা নিয়ে এতটা সোচ্চার ছিল না। ইসলাম নারীকে দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা অন্য কোন ধর্মে এতটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নি। ইসলাম নারীকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন দান করেছে। ইসলাম নারীর পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দান করেছে। শিক্ষা জীবন, বৈবাহিক জীবন ও কর্মজীবনেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এই সকল কিছু পবিত্র কোরআন মাজীদ ও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ দ্বারা লিপিবদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থগুলোতে নারীর অধিকার, মর্যাদা নিয়ে যা বলা হয়েছে তার সাথে ইসলামের অনেক মিল রয়েছে, যদিও সব অধিকার সংরক্ষণে হিন্দু ধর্মের দলিলের অভাব রয়েছে। কিন্তু প্রথাগত যে নিয়মগুলো হিন্দু ধর্মে চালু রয়েছে তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তো বটেই, তাদের নিজেদের শাস্ত্রের সাথেও যথেষ্ট অমিল পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো মূলত ইসলামের মুলনীতিগুলো সমর্থন করে। কিন্তু আধুনিক হিন্দুরা তাদের মনগড়া ধর্ম পালন করে।

শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের অবস্থান :

ইসলামে নারী শিক্ষাঃ

কুরআন, হাদীস উভয়ই পুরুষ ও নারীর জ্ঞানঅন্বেষণের অধিকারকে সমানভাবে সমর্থন করে[১]। কুরআন সব মুসলিমকে জ্ঞানঅন্বেষণের প্রচেষ্টা করতে আদেশ দিয়েছে, তাদের লিঙ্গ যাই হোক না কেন। কুরআন ও হাদিস মুসলানদেরকে বারবার পড়তে, চিন্তা-ভাবনা করতে এবং প্রকৃতিতে আল্লাহপ্রদত্ত উপকরণ থেকে শিক্ষা নিতে তাগীদ দিয়েছে[১]। এছাড়াও নারী-পুরুষ উভইকেই মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষাঅর্জনে উদ্‌ভুদ্ধ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, জ্ঞানঅন্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য[১]। পুরুষের মত প্রত্যেক নারীই নীতিগত ও ধর্মিয় এমন বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভূক্ত। যাতে তিনি জ্ঞানঅন্বেষণ করেন, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির চেষ্টা করেন, মননকে সমৃদ্ধ করেন, নিজের মেধা-প্রতিভার চর্চা করেন যাতে তার সুপ্ত সম্ভাবনার দ্বারা নিজে এবং তার সমাজ উপকার লাভ করতে পারে।[১]

হিন্দু রীতি অনুসারে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় এরকম সুস্পষ্ট কোন দলিল নেই। কিন্তু ইসলাম ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই নারী শিক্ষার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন হাদিস উভয়ীর নারী ও পুরুষের জ্ঞান অন্বেষণের অধিকার কে সমানভাবে সমর্থন করে। কুরআন সব মুসলিমকে জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা করতে আদেশ দিয়েছে তাদের লিঙ্গ যাই হোক না কেন। কুরআন ও হাদিস প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে পড়তে চিন্তা ভাবনা করতে এবং প্রকৃতিতে আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বারবার তাগিদ দিয়েছে। এছাড়া নারী পুরুষ উভয়কেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা অর্জনে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। পুরুষের মতো প্রত্যেক নারী নীতিগত ও ধর্মীয় এমন বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত যাতে সে জ্ঞান অর্জন করে, নিজের বুদ্ধি বৃদ্ধির সমৃদ্ধির চেষ্টা করে, মনকে সমৃদ্ধ করে, নিজের মেধা প্রতিভার চর্চা করে এবং তার সুপ্ত সম্ভাবনার দ্বারা নিজে এবং তার সমাজের উপকার করতে পারে।

এছাড়া নারীদের তালিম তাল্বিয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আছে,

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

"তোমরা তোমাদের নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও। "[সূরা ৪: নিসা আয়াত ১৯]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেন, " যার রয়েছে কন্যা সন্তান সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সবক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয় আল্লাহ

তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। " তিনি আরো বলেন, "তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।"

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, " ইলম অর্জন করা বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর প্রতি ফরজ। "[উম্মস সহীহাইন -ইবনে মাজাহ শরীফ]

আর তাই হাদিস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০ যা সব সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

হিন্দু ধর্মে নারী শিক্ষাঃ

বেদ ও উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে মেয়েরা ব্রহ্মচারিনী হতে পারে, শিক্ষা লাভ করতে পার[২]।

উদাহরণস্বরূপ, অথর্ববেদ বলে [২][৩]
ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্ |

একজন তরুণী কন্যা (মেয়ে) যিনি ব্রহ্মচর্য থেকে স্নাতক হন, তিনি উপযুক্ত স্বামী পান।
—অথর্ববেদ, ১১.৫.১৮

অর্থাৎ, হিন্দু ধর্মে শিক্ষাকে সকলের জন্য বাধ্যতামুলক করা হয় নি।

হরিত ধর্মসূত্র, পরবর্তী যুগের হিন্দু পাঠ্য বলে শিক্ষা গ্রহণের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের নারী রয়েছে: স্কুলে না গিয়ে যারা বিয়ে করা তারা হল সাধবধু এবং যারা প্রথমে স্কুলে যান বেদ অধ্যয়ন করে তারা হল ব্রহ্মাবাদিনী। হিন্দুশাস্ত্র ও স্মৃতিগুলি বিভিন্ন সংখ্যক সংষ্করের বর্ণনা দেয় (উত্তরণের অনুষ্ঠান)। উত্তরণের উপনয়ন অনুষ্ঠান শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরুর প্রতীক। বেদের মতো, প্রাচীন সূত্র এবং শাস্ত্র সংস্কৃত গ্রন্থগুলি মহিলাদের শিক্ষার অধিকার বাড়িয়েছিল, এবং যেসব মেয়েরা এই রীতি অতিক্রম করে তারপর পড়াশোনা করত তাদের ব্রহ্মাবাদিনী বলা হত।[৪][৫]

কিন্তু এই শিক্ষা গ্রহণ সার্বজনীন ছিল না। উচ্চ বংশীয় নারীরাই এই সুবিধা পেয়ে থাকত। ব্রাহ্মণ নারীরা তাদের পিতা বা ভাইদের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে টুকটাক কাব্য রচনা করত বা কেউ কেউ রাজস্ব কাজে নিয়জিত থাকত।

নারীদের সম্পত্তির অধিকারঃ

ইসলামে নারীর সম্পত্তির অধিকারঃ

ইসলামে নারীর সম্পত্তির অধিকারের উপরে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যা আর অন্য কোন ধর্মে এমনভাবে বলা হয়নি। ইসলামে স্ত্রী,কন্যা, মাতা, বোন নাতনি এমন কি বৈমাত্রেও বোন বা বৈপিত্রিয় বোনের সম্পত্তির অধিকারের কথা বর্ণনা রয়েছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে সূরা নিসায় বলা হয়েছে,

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِىٓ اَوْلَادِكُمْ وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
* لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ
اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ
كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى
الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ ؕ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন: পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। যদি দুই জনের বেশি নারী হয়, তাহলে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। আর একজন নারী হলে মোট সম্পদের অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে, তাঁর পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সে যদি নিঃসন্তান হয়, পিতা-মাতাই হয় উত্তরাধিকারী, তাহলে মাকে দেয়া হবে তিন ভাগের একভাগ। মৃতের ভাই বোন থাকলে মা সেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এসব বণ্টন মৃতের কোনো অসীয়ত থাকলে, তা এবং ঋণ থাকলে তা আদায় করার পরে। তোমাদের পিতা-মাতা এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততী, তোমাদের জানা নাই এঁদের মধ্যে তোমাদের কল্যাণের দিক দিয়ে কারা ঘনিষ্টতর। এই বণ্টন ব্যবস্থা ফরজ করে দেয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তো সব কিছুর ব্যপারেই পূর্ণ অবহিত এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী। আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তাঁরা নিঃসন্তান হয়। সন্তান থাকলে তোমরা পাবে ত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ। তাঁদের করে যাওয়া অসীয়ত এবং দেনা থাকলে, তা সব আদায়ের পর। আর তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের

তাঁরা পাবে চারভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। সন্তান থাকলে তাঁরা পাবে আট ভাগের একভাগ। তাও কার্যকর হবে তোমাদের কোনো অসীয়ত এবং দেনা থাকলে তা আদায়ের পর। আর যদি এমন কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক, যাঁর না আছে কোনো সন্তান, আর না আছে পিতা-মাতা। আছে এক ভাই অথবা এক বোন তাহলে তাঁদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাই বোন যদি দুই এর বেশি হয়, তাহলে তাঁরা সবাই মিলে মোট সম্পদের তিন ভাগের একভাগ পাবে। তাও কোনো অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা আদায়ের পর। কোনোভাবেই কারো কোনো ক্ষতি করা বা হতে দেয়া যাবে না। (এসব কিছু) আল্লাহর দেয়া উপদেশমালা। আর আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং পরম ধৈর্য্যশীল।"৪:১১-১২[৯] ”

এবং

يَسۡتَفۡتُوۡنَکَ ؕ قُلِ اللّٰہُ یُفۡتِیۡکُمۡ فِی الۡکَلٰلَۃِ ؕ اِنِ امۡرُؤٌا ہَلَکَ لَیۡسَ لَہٗ وَلَدٌ وَّ لَہٗۤ اُخۡتٌ فَلَہَا نِصۡفُ مَا تَرَکَ ۚ
وَ ہُوَ یَرِثُہَاۤ اِنۡ لَّمۡ یَکُنۡ لَّہَا وَلَدٌ ؕ فَاِنۡ کَانَتَا اثۡنَتَیۡنِ فَلَہُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَکَ ؕ وَ اِنۡ کَانُوۡۤا اِخۡوَۃً رِّجَالًا وَّ
نِسَآءً فَلِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَیَیۡنِ ؕ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمۡ اَنۡ تَضِلُّوۡا ؕ وَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ﴿۱۷۶﴾

"তাঁরা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন, নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে। যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যাঁর কোনো সন্তান নেই, আছে এক বোন। তাহলে সে পাবে সম্পদের অর্ধেক আর যদি বোন মারা যায় তাহলে ভাই পুরো সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয়, তাহলে ত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ তাঁরা পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তাহলে পুরুষেরা পাবে দুই ভাগ, আর নারীরা পাবে এক ভাগ। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তোমাদের জন্য যেন তোমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না যাও। প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই আল্লাহ পূর্ণ অবহিত।"৪:১৭৬[৯]

স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিতা লাভ করবে। যদি সন্তান না থাকে তবে সে তার স্বামীর সম্পত্তি চার ভাগের এক ভাগ এবং যদি সন্তান থাকে তবে আট ভাগের এক ভাগ পাবে।[৬]

ইসলামে কন্যা তার পিতার সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা রয়েছে।কন্যা যদি একজন হয় এবং মৃতের কোনো পুত্র সন্তান না থাকে তবে, তবে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক সে পাবে। কন্যা যদি অধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে তবে সমস্ত সম্পত্তি তিন ভাগের দুই অংশ পাবে। এবং কন্যার সাথে যদি পুত্র সন্তানও থাকে তবে পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ পাবে।[৬]

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার মায়ের ও অধিকার থাকে। বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির সহদর বোন বা তার দাদীয় সম্পত্তির অধিকার পেয়ে থাকে। ইসলামিক পূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় নারীদের

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। [৬]

আয়াতত্রয়ীর বর্ণনা মতে, ত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনের বেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ দুজনেই সমান। কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ কোরআনে সূরা বাক্কারায় বলা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ ؕ وَ لۡيَكۡتُبۡ بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبٌۢ بِالۡعَدۡلِ ۪ وَ لَا يَاۡبَ كَاتِبٌ اَنۡ يَّكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلۡيَكۡتُبۡ ۚ وَ لۡيُمۡلِلِ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَقُّ وَ لۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡئًا ؕ فَاِنۡ كَانَ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَا يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهٗ بِالۡعَدۡلِ ؕ وَ اسۡتَشۡهِدُوۡا شَهِيۡدَيۡنِ مِنۡ رِّجَالِكُمۡ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُوۡنَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَّ امۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰىهُمَا الۡاُخۡرٰى ؕ وَ لَا يَاۡبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ؕ وَ لَا تَسۡـَٔمُوۡۤا اَنۡ تَكۡتُبُوۡهُ صَغِيۡرًا اَوۡ كَبِيۡرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمۡ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ اَقۡوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدۡنٰۤى اَلَّا تَرۡتَابُوۡۤا اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيۡرُوۡنَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَلَّا تَكۡتُبُوۡهَا ؕ وَ اَشۡهِدُوۡۤا اِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۪ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيۡدٌ ۬ؕ وَ اِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّهٗ فُسُوۡقٌۢ بِكُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۲۸۲﴾

"হে ঈমানদারগণ, যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে লেনদেন কর, তাহলে তা লিখে নিয়ো। অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যের দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুষের আয়োজন না করা যায়, তাহলে একজন পুরুষ এবং যাঁদের সাক্ষীর ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও। যেন, একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"২৮২

ক্ষেত্রে নারী এগিয়ে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ এগিয়ে.

ইসলামী সমাজে নারী এবং পুরুষের প্রকৃতি এবং ভূমিকার পার্থক্যের ভিত্তিতে সাক্ষী দানের ক্ষেত্রে আলাদা মানদন্ড নির্ধারণ করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।

মুসলমানদের কাছে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের পরই নির্দেশনার জন্য মূল্যবান যে উৎস, তা হচ্ছে হাদিসগ্রন্থ।

" "আবূ সা'ঈদ খুদরী সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিতরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন,

এটা নারীদের জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই। (৩০৪)" (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৪৮২)

হযরত আবু হুরায়রা সর্বাধিক ৫৩৭৪ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণিত হাদিস সমূহ শুধু তার একক স্বাক্ষীর ওপরেই বিশুদ্ধতার সকল বিবেচনায় উত্তীর্ণ। আবার হাদিসগ্রন্থ সমূহের মধ্যে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০ টি। যা সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তিনি একজন নারী। আর তার বর্ণিত হাদিস সমূহও শুধু তার একক সাক্ষ্যের ওপরেই বিশুদ্ধতার সকল বিবেচনায় উত্তীর্ণ।এক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। ঘটনার প্রকৃতি ও ভূমিকা ঠিক থাকলে, ইসলামে একজন নারী সাক্ষীই যথেষ্ট। ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদেরা অনেকেই এ ব্যাপারে একমত, যে চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন বিশ্বাসী নারীর সাক্ষীই যথেষ্ট। তবে, ঘটনার প্রকৃতি এবং ভূমিকা বদলে গেলে সাক্ষীর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। সাধারণত ইসলাম পর্দার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাই ইসলাম নারীদের ওপর কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা দায়দায়িত্ব আরোপ করেনি। যেসব ক্ষেত্রে ঘটনার প্রকৃতি আর্থিক এর মত (ইসলামী মতে যা অধিক পুরুষ সংশ্লিষ্ট) সেসব ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষ সাক্ষীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু ধর্মে সম্পত্তির অধিকারঃ

হিন্দুশাস্ত্রের সম্পত্তি বন্টনের দুইটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। একটি হল দায়ভাগ পদ্ধতি এবং আরেকটি হল মিতাক্ষরা পদ্ধতি,

দায়ভাগ আইনের সপিন্ড এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা মাত্র পাঁচ জন।এরা আবার দুই প্রকার। পিতৃ কুলের সপিন্ড এবং মাতৃকুলের সপিণ্ড। পিতৃকুলের সপিন্ড বর্তমান থাকলে মাতৃকুলের সত্য পায় না। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবীর সূত্র স্বীকার করে না। মৃত ব্যক্তি শপিন্ড ওদের প্রথম চার স্তরের অর্থাৎ পুত্র বা পুত্রের বিধবা স্ত্রী, , প্রৌত্র বা প্রৌত্রের বিধবা স্ত্রী, প্রপ্রৌত্র বা প্রপ্রৌত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। পেলেও তাতে জীবনস্বত্বের শর্ত প্রযোজ্য। জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায় যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সম্পত্তি শুধুমাত্র ভোগ করে যাবে সম্পত্তি দান, বিক্রি বা বিলি করতে পারবেনা। অর্থাৎ মালিকানার পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ ওই সম্পত্তির উপর তার পূর্ণ অধিকার থাকে না। এই সম্পত্তিতে সীমিত অধিকার জন্মায়। জীবন সত্য কেড়ে নেয়া হয় যদি অবিবাহিত কন্যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তদ্রূপ বিধবা যদি অন্যত্র বিবাহ করে তারও ভোগস্বত্ব বাতিল হয়। জীবনস্বত্ব প্রাপ্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যাবে। তবে বাস্তবতা এই যে কন্যা সহ যা অন্য চারজন মহিলাকে সপিণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে তাদের অংশ পাবার তেমন সম্ভাবনা নেই। পেলেও তাতে আবার জীবন সত্যের শর্ত প্রযোজ্য।[৬]

দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিশ কোন জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না অন্যান্য ওয়ারিস কোণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না।[৬]

মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীণী হতে পারবেন না। এই আইন অনুযায়ী যৌথ পরিবারের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। ফলে পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্র তার অংশ দাবি করতে পারে কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে না।[৬]

বিবাহের ব্যাপারে দুই ধর্মের অভিমতঃ

ইসলাম ধর্মে বিবাহঃ

ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুযায়ী, বিবাহ হল একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে নিষ্পন্ন বৈধ বন্ধন ও সামাজিক চুক্তি । ইসলামে বিবাহ হল একটি সুন্নাহ বা মুহাম্মাদ(সা) এর আদর্শ এবং ইসলামে বিবাহ করার জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[৭][৮] পাশাপাশি, ইসলামে সন্ন্যাসজীবন এবং কৌমার্যেরও কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে।[৮]

একজন ব্যক্তি তখনই বিবাহের বয়সী হবে, যখন সে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে বৈবাহিক জীবন নির্বাহ করতে সমর্থ হবে । বিশেষ শর্তসাপেক্ষে পুরুষের বহুবিবাহের জন্য ইসলামে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে নারীর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থ: “হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক উৎস থেকে। আর তা থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর তা থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।” (সূরা নিসা, আয়াত ০১)

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیْرًا ﴿۳۴﴾

“পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।” (সুরা নিসা: ৩৪)

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে বিবাহের রুকন বা মূল স্তম্ভ হচ্ছে দু'টি। ১.ইজাব তথা প্রস্তাব, ২.কবুল, বা গ্রহণ। এর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে সাক্ষী থাকা।

যে নারীকে বিয়ে দেওয়া হবে সে কুমারি হোক কিংবা তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হোক সবার ক্ষেত্রেই বিয়ে দেয়ার আগে মতামত নেওয়া বা অনুমিত গ্রহণ করা আবশ্যক। যিনি বিয়ের অভিভাবক হবেন তার জন্য অবশ্যই নারীর কাছ থেকে বিয়ের আগে অনুমতি বা মতামত গ্রহণ করা জরুরি।

নারী-পুরুষ কারো সম্মতি বা অনুমতি না ছাড়া অভিভাবক একজনকে অপরজনের সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া মোটেও ইসলামের মূলনীতি নয়। বরং তা কুরআনের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও। কিন্তু তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (সুরা নিসা : আয়াত ১৯)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সায়্যিবাহ (আগে বিয়ে হয়েছে এমন তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা) বিবাহিতা নারীর মতামত বা সম্মতি গ্রহণ ছাড়া তার বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী নারীকে তার অনুমতি ব্যতিতও বিয়ে দেওয়া যাবে না।' তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, কুমারী নারীর অনুমতি আবার কিভাবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তার চুপ থাকাই অনুমতি।' (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলাম আসলে পুরুষদের অসংখ্য বিয়ের সুযোগ রহিত করে দিয়েছে। ইসলাম বিবাহ বিমুখ সমাজে এসে লোকদেরকে পাইকারী হারে চারটি করে বিয়ের নির্দেশ দেয় নি, বরং নারীদের যথেচ্ছ ব্যবহারে উন্মুখ সমাজে পুরুষদের শতাধিক বিয়ের ক্ষমতাকে রহিত করে দিয়ে তাকে সর্বোচ্চ চারটির মধ্যে স্থির করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নারীদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হতো। এক একজন ব্যক্তির স্ত্রীদের কোন সীমা রেখা ছিলো না। শুধু মুসলমান নয় অন্যান্য ধর্মের অনুসারি সহ অনেকের স্ত্রীদের সংখ্যা ছিলো ১০০ (একশত) এরও বেশি। ১০/১৫ টি ছিলো সাধারণ বিষয়।

ইসলাম পুরুষদেরকে একাধিক তথা চারটি বিয়ের 'নির্দেশ' দেয়নি, বরং প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে 'অনুমতি' দিয়েছে। যদি শর্ত পূরণ করা না যায়, তাহলে একটির অধিক বিবাহ করাকেও হারাম বলেছে। [৯]

ইরশাদ হয়েছে,

"তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি।"(সূরা নিসা, আয়াত ৩)

হিন্দু ধর্মে বিবাহঃ

হিন্দু গ্রন্থ যেমন অথর্ববেদ [১২] এবং মনুস্মৃতি III.20-34,[১০] বিবাহের আটটি রূপকে চিহ্নিত করে। তারা ঐতিহ্যগতভাবে উপস্থাপিত হয়, এখানে, তাদের ধর্মীয় উপযুক্ততার ক্রমানুসারে (প্রশস্ত)। তারা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে ভিন্ন।[১১][১২]

যদিও এই সমস্ত বিবাহ স্বীকৃত, সকলেরই ধর্মীয় অনুমোদন নেই; তাদের মধ্যে চারটি ধার্মিক বলে ঘোষণা করা হয় এবং বাকি চারটি অধার্মিক বলে ঘোষণা করা হয়।[১৩]

ব্রাহ্ম বিবাহ

ব্রহ্মবিবাহ হল বিবাহের একটি ধার্মিক রূপ । এটি একটি ভাল আচরণের, বেদে শেখা এবং নিজের দ্বারা আমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে নিজের মেয়ের বিবাহকে বোঝায়। ব্রাহ্ম বিবাহ হল যেখানে একটি ছেলে জীবনের প্রথম পর্যায়ে তার শিক্ষা শেষ করার পরে বিয়ে করতে সক্ষম হয়, ব্রহ্মচর্য । হিন্দু বিবাহের আট প্রকারের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহের সর্বোচ্চ স্থান রয়েছে। যখন একটি ছেলের পিতামাতা একটি উপযুক্ত পাত্রী খোঁজেন, তখন তারা তার পারিবারিক পটভূমি বিবেচনা করেন এবং মেয়েটির পিতা নিশ্চিত করবেন যে তার মেয়ের সম্ভাব্য বর একজন পণ্ডিত, যিনি বেদগুলিতে পারদর্শী।[১৩]

দৈব বিবাহ

দৈববিবাহ হল বিবাহের একটি ধার্মিক রূপ । এটি প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কাছে অনন্য এক ধরনের বিবাহ, যেখানে একজন ব্যক্তি একটি নামমাত্র বলিদানের পারিশ্রমিক প্রদানের পরিবর্তে প্রাক্তনের বলিদান অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালনকারী পুরোহিতের সাথে বিবাহের জন্য তার সমৃদ্ধ মেয়ের হাত উপহার দেন। বিবাহের এই ফর্মটিকে, দ্বিতীয় সর্বাধিক মেধাবী হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে, সাতটি আরোহী এবং বংশধরদের পাপ মোচন করার জন্য বিবেচিত হয়। এটিকে এরূপ বলা হয় কারণ এটি দেবতাদের নিজেদের যোগ্য বলে বিশ্বাস করা হয়।[১৩]

অর্ষার বিয়ে

অর্শবিবাহ হল বিবাহের একটি ধার্মিক রূপ। এটি এমন এক ধরনের বিবাহ যেখানে একজন পুরুষ তার কন্যাকে কনে হিসেবে উপহার দেন, বরের কাছ থেকে এক জোড়া গরু, একটি গরু এবং একটি ষাঁড় বা দুই জোড়া পাওয়ার পর, বিনিময়টিকে আইনের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বরং প্রাক্তনের মেয়ের বিক্রয়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এক জোড়া গাভীর বিনিময়ে নিজের কুমারী কন্যাকে বধূরূপে নিবেদনের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩]

প্রজাপত্য বিবাহ

প্রজাপত্যবিবাহ হল বিবাহের একটি ধার্মিক রূপ। এটি এমন একটি বিবাহ যেখানে একটি মেয়ের বাবা বরকে বিয়েতে তার হাত দেন, তার সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করেন এবং নিম্নলিখিত

শব্দগুলির সাথে তাদের সম্বোধন করেন: 'তোমরা উভয়ে একসাথে আপনার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন কর' (সংস্কৃত : Hyā kanyēśīṃ dharmacēṃ ācaraṇa কারা, বা প্রজোত্পাদনার্থ কন্যার্পণ) । একটি প্রজাপত্য বিবাহে, কনের পিতা অন্য পথের পরিবর্তে একটি বরের সন্ধানে যান, যা এটিকে ব্রাহ্ম বিবাহের চেয়ে নিকৃষ্ট করে তোলে।[১৩]
একটি গাছের নিচে মালা বিনিময় করছে এক দম্পতি। সৌগন্ধিকা পরিণায়া থেকে চিত্রণ

গন্ধর্ব বিবাহ

গন্ধর্ববিবাহ হল বিবাহের একটি রূপ যা সাধারণভাবে অ-ধার্মিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এটি সহবাস যা একটি যুবক এবং একটি মেয়ের মধ্যে ভাগ করা পারস্পরিক ভালবাসা থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল যৌন মিলন। কারো পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনো পরামর্শ বা আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ ছিল এই শ্রেণীর বিবাহের ঐতিহাসিকভাবে উদযাপনের উদাহরণ। এটি সাধারণত ক্ষত্রিয় বর্ণের সদস্যদের এবং শুধুমাত্র বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের জন্যই অনুমোদিত বলে মনে করা হয় স্মৃতি গ্রন্থ অনুসারে , যদিও বর্তমান সময়ে এটি ক্রমবর্ধমানভাবে প্রচলিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ডেটিং. [১৩]

অসুর বিবাহ

অসুরবিবাহ হল বিবাহের একটি অ-ধার্মিক রূপ । এটি এমন এক ধরনের বিবাহ যেখানে একজন বর কনে এবং তার আত্মীয়স্বজনকে তার নিজের ইচ্ছামত সম্পদ প্রদান করার পরে একটি কন্যাকে গ্রহণ করে। কনের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহের একটি রূপ হিসাবে , এটি সাধারণত নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও এটি কখনও কখনও বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের সদস্যদের জন্য অনুমোদিত বলে উল্লেখ করা হয়।[১৩]

রাক্ষস বিবাহ

রাক্ষসবিবাহ হল বিবাহের একটি অ-ধার্মিক রূপ। এটি একটি অসম্মতিহীন কুমারীকে জোর করে ধরে নেওয়ার পরে বা পুরুষের দ্বারা অপহরণ করার পরে সম্পাদিত বিবাহ। যখন এই ধরনের একটি মেয়েকে অপহরণ করা হয়, তখন তার আত্মীয়দের লাঞ্ছিত ও হত্যা করা হয় এবং তাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে তাকে কাঁদতে বর্ণনা করা হয়। এরপর পাত্রীর বাবার অনুপস্থিতিতে তার অপহরণকারীর পরিবার বিয়েটি উদযাপন করে। এটি একটি বিবাহের একটি নিন্দনীয় রূপ যা মনুস্মৃতি দ্বারা নিন্দা করা হয় এবং বর্তমান সময়ে সমাজে আইন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়।[১৩]

পৈশাচের বিয়ে

পৈশাচবিবাহ হল বিবাহের একটি অ-ধার্মিক রূপ। যখন একজন পুরুষ ঘুমন্ত, নেশাগ্রস্ত বা মানসিক প্রতিবন্ধী কোনো নারীকে চুপিসারে ধর্ষণ করে, তখন সেটাকে বিয়ে বলে গণ্য করা হয়, যদিও শুধুমাত্র নারীর সম্মান রক্ষার জন্য। মনুস্মৃতিতে একে পাপ কাজ বলে নিন্দা করা হয়েছে। আধুনিক সময়ে, এটিকে ডেট রেপ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় , এবং বেশিরভাগ দেশে এটি একটি অপরাধ।[১৩]

জেমস লোচটেফেল্ড মন্তব্য করেছেন যে এই শেষ দুটি রূপ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বিবাহগুলি এখনও প্রাচীন হিন্দু সমাজে স্বীকৃত ছিল, এই কাজগুলিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য নয়, বরং সমাজে মহিলা এবং এর ফলে শিশুকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করার জন্য।[১৩]

যদিও ভারতীয় উপমহাদেশের বেশিরভাগ হিন্দুরা আজ প্রধানত একবিবাহের অনুশীলন করে, বহুবিবাহিত বিবাহগুলিও সহস্রাব্দ ধরে হিন্দু সমাজকে চিহ্নিত করেছে।

বহুবিবাহ বলতে এক ধরনের বিবাহকে বোঝায় যেখানে একজন পুরুষ একই সময়ের মধ্যে একাধিক নারীকে বিয়ে করেন। যদিও বহুবিবাহ মূলধারার হিন্দু সমাজের আদর্শ ছিল না, একাধিক স্ত্রী থাকা একটি সামাজিক প্রথা ছিল যা একজন পুরুষের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে বলে বিশ্বাস করা হত। রয়্যালটি এবং আভিজাত্যের সদস্যরা প্রায়শই বহুগামী ছিল এবং তারা এমন কয়েকজনের মধ্যে ছিল যারা তাদের পরিবারের একাধিক স্ত্রীকে সমর্থন করতে পারে। দ্বিজ (দুইবার জন্মানো) বর্ণের সদস্যদের মধ্যে মনুস্মৃতি দ্বারা বহুবিবাহ অনুমোদিত হয়েছিল : ব্রাহ্মণদের চারটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ক্ষত্রিয়দের তিনটি স্ত্রী থাকতে পারে এবং বৈশ্যদের দুটি স্ত্রী থাকতে পারে; তবে শূদ্রদের শুধুমাত্র একটি স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। [৩৭] আপস্তম্ব ধর্মসূত্র একজন পুরুষকে দশ বছর পর নতুন স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দেয় যদি তার বর্তমান স্ত্রীকে বন্ধ্যা বলে বিচার করা হয় এবং তার স্ত্রী যদি শুধুমাত্র কন্যাসন্তান জন্মায় এবং সে একটি পুত্র কামনা করে তাহলে তেরো বা চৌদ্দ বছর পর বিয়ে করতে পারে। 1955 সালের হিন্দু বিবাহ আইন পাস হওয়া পর্যন্ত , ভারতের প্রত্যেক হিন্দুকে তাত্ত্বিকভাবে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[১৩]

শাস্ত্রীয়ভাবে নারীদের অধিকার সংগ্রহের কথা বলা হলেও প্রথাগত হিন্দুধর্মে নারীকে করা হয়েছে তুচ্ছ, হেয়। প্রথাগত হিন্দু ধর্মে নারীদের অধিকারের ব্যাপারে কোনো লক্ষ্যই রাখেনি। এ ধর্মের মতো এতো কঠোর বিধান অন্য কোনো ধর্মে নেই। সতীদাহের মতো নির্মম অমানুষিক বিয়ে কিংবা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করার অনুমতি লাভ করতে পারে। কিন্তু নারী স্বামী হারানোর পর বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, আরেক বিয়ে তো দূরের কথা, স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ না হলে মৃত স্বামীর সঙ্গে ছটফট করে পুড়ে মরতে না পারলে তার স্বর্গ লাভ হবে না। যদি কোনো নারী এই সতীদাহ হতে বেঁচেও যেত; ঘরে সমাজে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের কাছে তার কোনো সম্মান

থাকতো না। তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনায় এমনভাবে বিদ্ধ করা হতো, যার ফলে তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয় মনে হতো।[১৪]

হিন্দু ধর্মে স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর জীবন সুখের কিন্তু অসৎ হলে তার জুলুম নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেবার কোনো পথ রাখেনি। এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে 'অসদাচরণ করা পাপ' এ কথাও বলে দেয়নি স্বামীকে বরং উল্টো বলা হয়েছে, নারী দিন রাত্রীর কোনো সময় স্বাধীন থাকতে পারবে না, সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর থাকবে। (মনু) নারী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত নয়। (মনু) বাবা মেয়েকে যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন সেখানেই আজীবন থাকতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোনো পুরুষের ঘর সংসার করতে পারবে না। অর্থাৎ আজীবন বিধবা হয়ে থাকতে হবে। হিন্দু আইনে আছে- অদৃষ্ট নরক, বন্য ও বিষধর সর্প এর কোনোটাই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়।[১৪]

যৌতুক বা মোহরানা নিয়ে দুই ধর্মের মতামতঃ

ইসলামী মোহরানা পদ্ধতি

ইসলামে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষিত করার জন্য বরের কাছ থেকে কনের জন্য মোহরানা আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামে, মহর বা মোহর হল বিবাহের সময় কনের দাবিকৃত অর্থ বা সম্পদ, যা বর বা বরের পিতার পক্ষ থেকে কনেকে প্রদান করতে হয়| মোহরানা ধার্য করা ওয়াজিব। এটি প্রদান করা বাধ্যতামুলক| মহরের মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ বিয়েকে বৈধ করা হয়| প্রাচীন আরবে যৌতুক দেয়ার প্রথা চালু ছিল, নবুয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে যৌতুক প্রথাকে নিষিদ্ধ করে আবশ্যক দেনমহরপ্রথা চালু করেন| ইসলামে মহরের কোন সীমারেখা

নেই| মোহর বাকি না রেখে যথাসাধ্য আদায় করতে বলা হয়েছে, যেন কনের মহর প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়|

যদি মহরানা ধার্য না করে বিয়ে করে ফেলে তারপরও স্ত্রীকে মহরানা দিতে হবে। এটা কোন মতেই বাদ দেয়া যাবে না। এসম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا ﴿۱﴾

"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও।" (সুরা নিসা: ৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا جَآءَكُمُ الۡمُؤۡمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامۡتَحِنُوۡهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاِيۡمَانِهِنَّ ۚ فَاِنۡ عَلِمۡتُمُوۡهُنَّ مُؤۡمِنٰتٍ فَلَا تَرۡجِعُوۡهُنَّ اِلَى الۡكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمۡ وَ لَا هُمۡ يَحِلُّوۡنَ لَهُنَّ ؕ وَ اٰتُوۡهُمۡ مَّاۤ اَنۡفَقُوۡا ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اَنۡ تَنۡكِحُوۡهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ ؕ وَ لَا تُمۡسِكُوۡا بِعِصَمِ الۡكَوَافِرِ وَ سۡـَٔلُوۡا مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ وَ لۡيَسۡـَٔلُوۡا مَاۤ اَنۡفَقُوۡا ؕ ذٰلِكُمۡ حُكۡمُ اللّٰهِ ؕ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۱۰﴾

"তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর।" (সুরা মুমতাহিনা: ১০)

হিন্দু ধর্মের যৌতুক প্রথাঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে যৌতুকের ধারণা এবং প্রথা অস্পষ্ট। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে ঐতিহাসিক হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রচলিত ছিল, কিন্তু কেউ কেউ তা করেন না। ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষদর্শীদের রিপোর্ট (নীচে আলোচনা করা হয়েছে), প্রস্তাব করে যে, ১১-শতাব্দীর পূর্বে যৌতুকের হিন্দু সমাজ তুচ্ছ ছিল এবং কন্যাদের উত্তরাধিকার অধিকার ছিল, যা প্রথা অনুযায়ী তার বিয়ের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৩]

স্ট্যানলি জে তাম্বিয়া প্রাচীন ভারতে প্রাচীন মানুষের যৌতুক ও কনে -সম্মতি অনুমোদিত বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যৌতুক ছিল আরও মর্যাদাপূর্ণ রূপ এবং ব্রাহ্মণ্য (পুরোহিত) জাতের সাথে যুক্ত। .নববধূ নিম্নবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যাদের যৌতুক দেওয়ার অনুমতি ছিল না।তিনি বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে দুটি গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তথ্য দিয়ে বলেছেন যে উচ্চবর্ণের যৌতুকের প্রণালী এবং নিম্নবর্ণের বধূদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

তবে, যেহেতু হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে মেয়েদের উত্তরাধিকার হওয়ার অধিকার নেই, বা বাবার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই , তাই বাবা তার কন্যার বিয়ের সময় সমস্ত খরচ করে, কন্যাকে উপহার দেয় তার সাধ্যমত। এখান থেকেই পরবর্তীতে যৌতুক প্রথা চালু হয়।

বিধবা বিবাহের ব্যাপারে দুই ধর্মের মতামতঃ

ইসলাম ধর্মে বিধবা বিবাহঃ

ইসলাম বিধবা নারীদের বিয়ের ব্যাপারে শুধু অনুমোদন নয়, উৎসাহও দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন,

وَ الَّذِیۡنَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنۡکُمۡ وَ یَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا یَّتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ اَرۡبَعَۃَ اَشۡهُرٍ وَّ عَشۡرًا ۚ فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیۡمَا فَعَلۡنَ فِیۡۤ اَنۡفُسِهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ﴿۲۳۴﴾

'আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীগণকে রেখে যায়, উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের বিরত রাখবে চার মাস দশ দিন। অতঃপর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধিমতো ব্যবস্থা নিলে কোনো গুনাহ হবে না।' (সুরা বাকারা : ২৩৪)

নারী হোক বা পুরুষ, কারোই বিয়ে ছাড়া একাকী জীবনযাপন করাটাকে ইসলাম পছন্দ করে না। এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন,

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۳۲﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়ামা' তাদের বিয়ে করিয়ে দাও' (সুরা নুর : ৩২)।
এ আয়াতে 'আয়ামা' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন নারী-পুরুষ যারা বর্তমানে বিয়েহীন অবস্থায় রয়েছে। এমন নারী-পুরুষকে বিয়ে দেওয়ার জন্য কুরআন অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে। এই বিধানের দাবি এটাই যে, কোনো নারী-পুরুষ যেন বিয়ে ছাড়া না থাকে। সমাজে ব্যভিচার বন্ধের প্রধানতম পথ হলো বিয়ে। আর কুমারী মেয়েদের তুলনায় বিধবা নারীদের বিয়ের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ তারা স্বামীর সঙ্গে সময় কাটিয়েছে। এখন একাকী সময় কাটানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। তা ছাড়া তাদের বিয়ে না হলে তাদের শারীরিক সুস্থতা, ইজ্জত-আব্রু, কখনো কখনো দ্বীন-ধর্ম সবকিছুই বরবাদ হয়ে যেতে পারে।

বিধবা নারীদের দ্বিতীয় বিয়েতে ইসলামে কোনো নিষেধ নেই, বরং ইসলাম দ্বিতীয় বিয়েকে উৎসাহিত করেছে। রাসুলের (সা.) স্ত্রীদের মধ্য হতে শুধুমাত্র উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা। স্বয়ং বিশ্বনবী (সা.) যুবক বয়সে প্রথম যাকে বিয়ে করেন তিনিও ছিলেন একজন বিধবা নারী। বিশ্বনবী (সা.) প্রথমেই বিধবা নারীকে

বিয়ে করার মাধ্যমে বিধবা নারীদের পক্ষ অবলম্বন করে জগদ্বাসীদের মধ্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিধবাদের বিয়ে করা দোষের কিছু নয়। তিনি যে শুধু বিধবাদের বিয়ে করেছেন তা নয়, বরং বিধবা নারীদের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিধবা ও মিসকিনদের সহায়তা দানকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী অথবা রাত্রিবেলা সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর ন্যায়।' (বুখারি : ৫৩৫৩)

বিধবা নারীদের সহায়তা করা সওয়াবের কাজ। আর সহায়তার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো তাকে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। একজন পুরুষের যেহেতু চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ রয়েছে, তাই সুযোগ থাকলে বিধবা নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে সহায়তার সুযোগ গ্রহণ করা। সমাজে অনেকে অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (শরিয়তসিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও) গার্লফ্রেন্ড রাখে, রক্ষিতা রাখে, পতিতাকে বেছে নেয়। অথচ এ ক্ষেত্রে একজন বিধবা নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে নিজের অতিরিক্ত চাহিদা মিটিয়ে সওয়াব অর্জন করতে পারে এবং গুনাহ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যেসব পুরুষরা বিধবা নারীদের বিয়ে করে তাদের ভর্ৎসনা বা বাঁকা চোখে না দেখে তাদের উৎসাহ প্রদান করা।

তবে হ্যাঁ, কোনো বিধবা নারীর যদি বিয়ের বয়স না থাকে অথবা সে বিধবা হওয়ার পরও এতিম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করতে না চায়, কষ্ট হলেও একাকী জীবনযাপনের পথ বেছে নেয় এবং নিজের চরিত্র, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তা হলে এমন বিধবা নারীকে বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। এরূপ বিধবা নারীর জন্য বিশ্বনবীর (সা.) বাণীতে রয়েছে সান্ত্বনা পুরস্কারের ঘোষণা। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি এবং (নিজের যত্ন না নেওয়ায়) চেহারায় দাগ পড়া নারী পরকালে এভাবে থাকব অথবা মধ্যমা আঙুলের চেয়ে বেশি দূরত্ব থাকবে আমাদের মধ্যে। সে হলো সেই নারী, যার স্বামী মারা গেছে এবং তার বংশীয় মর্যাদা ও সৌন্দর্য থাকার পরও সে নিজেকে (বিয়ে থেকে) বিরত রাখে এতিম সন্তানদের জন্য-যতক্ষণ না সন্তানরা (স্বাবলম্বী) পৃথক হয়ে যায় অথবা মারা যায়।' (আবু দাউদ : ৫২৪৯)

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে বিধবাদের অবমূল্যায়ন করা হলেও ইসলাম ধর্ম বিধবাকে মূল্যায়ন করেছে। তার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। বিধবাকে কখনো 'অপয়া' মনে করেনি।

হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহঃ

বিধবাদের ঐতিহ্যগতভাবে আধ্যাত্মিক, তপস্বী জীবন, বিশেষত ব্রাহ্মণদের মত উচ্চ বর্ণের প্রত্যাশা করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল।[৮২] পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ ছিল।[৮৩] এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা এখন শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক বিধবাদের দ্বারা কঠোরভাবে পালন করা হয়। [৮২][৮৩]

এককালে স্বামীর মৃত্যুর পর কমবয়সী বিধবাদের তাঁদের বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হত।পতিগৃহে সাধারণভাবে তাঁদের স্থান ছিল না। সিঁথির সিঁদুর মুছে, দেহের সব অলঙ্কার খুলে ফেলে, চুল কেটে, সাদা থান পরে, এক বেলা নিরামিষ খেয়ে অনশন-ক্লিষ্ট অবস্থায় তাঁদের বৈধব্য পালন করতে হত। কারণ ছিল বিধবা নারীর যৌবন, দীর্ঘ কেশ ও রঙিন শাড়ী-গয়নায় পুরুষরা আকৃষ্ট হয় - তাই এই ব্যবস্থা। বিধবা নারীর নিজের মধ্যেও যেন কামনার উদ্রেক না হয়, তার জন্য শুধু আমিষ বর্জন নয়, অনেক জায়গাতে মুসুর ডাল, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খাওয়ার ব্যাপারেও বাধানিষেধ ছিল, কারণ এগুলি এবং আমিষকে মনে করা হত কামোত্তেজক খাদ্য! বাপের বাড়িতে ভাইদের সংসারেও বিধবাদের স্থান উচ্চে ছিল না। বাড়ির সব কাজ তাঁদের দিয়েই করানো হত। বিধবাদের পুনর্বিবাহ কল্পনা করাও ছিল পাপ। বিধবারা সংসারের কাজ করে শুদ্ধমনে পবিত্র জীবনযাপন করবে এইটেই ছিল সমাজের দাবী।
এবার যদি পাঠকরা ভাবেন এটা হল হিন্দু ধর্মে নারীর স্থান তবে আমি বলবো এই হল হিন্দু সামাজিক কুসংস্কার। এর একটি কাজকেও হিন্দু ধর্মে কোনো ভাবে সম্বতি দেয় না।ঐ সময়ের কিছু আগের থেকেই সমাজের কিছু প্রগতিশীল লোক পণ্ডিতদের সাহায্যে কিছু কুটিল ধর্মীয় হিন্দু পণ্ডিত প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নই ।কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহাশয় ও অন্যান্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তাঁদের এই ভণ্ডামি টেঁকে নি।এনারা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে আসল সত্য টা বের করে এনে ছিলেন এবং এর সাথে সাথে ১৮৫৬ সালে গৃহীত বিধবাবিবাহ আইনটি বিধবাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য আরেকটি বড় পদক্ষেপ ছিলো। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এবার দেখে নিয় হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ কি বলে।
ঋগ্বেদ ১০.১৮.৭
ইমা নারীরঅবিধবাঃ সুপত্নীরাজ্ঞনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঃনমীবাঃ সুরত্মা আ রোহন্তু জনয়ো য়োনিমগ্রে।।

অর্থাৎ, বিধবা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, হে নারী তোমার স্বামী এখন মারা গেছে। তুমি আবার পুনরায় জীবিত পতি গ্রহণ কর,যে তোমার হাত গ্রহণ করবে ও তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করবে,তুমি সারা জীবন তোমার এই নতুন পতীর সাথে জীবন সঙ্গী হিসাবে আবদ্ধ হও।

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে দুই ধর্মের বিধানসমূহঃ

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে ইসলামের কথাঃ

তালাকের মাস'আলা ইসলামিক বিধানের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও কঠিন মাস'আলার একটি। ইসলামিক রীতি অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে যদি বনিবনা না হয় এবং কোনোভাবেই তাদের মিল হওয়া সম্ভব না হয় অথবা জুলুম-নির্যাতন বা কোনো অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি রয়েছে। প্রয়োজনে ও যৌক্তিক কারণে স্বামী তালাক দিতে পারে, তদ্রূপ স্ত্রীও তালাক চাইতে পারে। তবে ইসলামী শরিয়ত মতে, তালাকের ক্ষমতা স্বামীর হাতে ন্যস্ত।তবে, বভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে নারীরাও তাদের স্বামীকে তালাক দিতে পারে। একজন অত্যাচারী, অকর্মণ্য বা অ-মনঃপূত স্বামী থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণের পূর্ণ অধিকার নারীর রয়েছে।ে স্ত্রীর ওপর স্বামীকে যেসব অধিকার দেয়া হয়েছে, সেগুলো সদাচার ও দয়াদ্র ব্যবহারের সঙ্গে প্রয়োগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআন বলে,

'তোমরা তোমাদের নারীদের সঙ্গে সদাচরণ কর।' পারস্পরিক সম্পর্ককে দয়াদ্র ও স্নেহশীল করতে ভুলো না।'

প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন,

'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম।'

এগুলো শুধুমাত্র নৈতিক উপদেশ নয়। যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর অধিকার প্রয়োগে অন্যায় করা হয়, তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার স্ত্রী সংরক্ষণ করবে। কোনো কারণে নারী পূর্ব স্বামী

থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তার পরবর্তী বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এ বিষয়ে পূর্ব স্বামী কিংবা আত্মীয়স্বজনের বাধা প্রদান করার কোনো এখতিয়ার নেই।

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে হিন্দু ধর্মের কথাঃ

অর্থশাস্ত্রের ৮.১০১-৮.১০২ পদে ঘোষণা করে যে, একজন নারী বা পুরুষের দ্বারা বিবাহ ভেঙে দেওয়া যাবে না।[৪৮] তবুও, পাঠ্য, অন্যান্য বিভাগে, বিবাহকে ভেঙে দেওয়ার অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্লোক ৯.৭২-৯.৮১ পুরুষ বা মহিলাকে প্রতারণামূলক বিয়ে বা অপমানজনক বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে এবং পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি দেয়; এই লেখাটি একজন নারীর পুনরায় বিয়ে করার আইনি উপায়ও প্রদান করে যখন তার স্বামী নিখোঁজ থাকে বা তাকে পরিত্যাগ করে। [১৩]

এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ হিন্দু সমাজে বিবাহবিচ্ছেদকে একটি অশ্লীলতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও অনেক উপ-জাতি এবং উপজাতি রয়েছে যারা সর্বদা বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। বেশিরভাগ হিন্দু পণ্ডিত এবং প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ গোঁড়া হিন্দুরা বুঝতে পারেন না যে এই ধরনের ঘটনার জন্য পবিত্র আইনে বিধান করা হয়েছে। যদিও মধ্যযুগীয় এবং সাম্প্রতিক সময়ে এটি কখনই একটি বিকল্প ছিল না এবং এর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, এবং পরবর্তীকালে অকথ্য দুর্ভোগের ফলে দম্পতিরা সামাজিক চাপে একসাথে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। অকার্যকর পরিবারে থাকার অন্যতম শক্তিশালী কারণ ছিল নারীর আর্থিক নির্ভরতা এবং তালাকপ্রাপ্ত হওয়া থেকে সামাজিক কলঙ্ক এবং বিচ্ছিন্নতা এবং অবশ্যই সন্তান ও হেফাজতের বিষয়টি।

संअन्यस्य यो मनुष्यः स्याद् अनुष्यः स्वयोषिति । लभेत सान्यं भर्तारं एत कार्यं प्रजापतेः ॥

অন্যস্যঃ য়ো মনুষ্যঃ স্যাদ অমানুষ্যঃ স্বয়োষিতি | লভেতা স্যান্যম ভর্তারাম ইতঃ কার্য্যম প্রজাপতেঃ ||

যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম হয় তবে সে তাকে তালাক দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এটি প্রজাপতি [প্রজননের প্রভু] দ্বারা প্রবর্তিত আইন (নারদ 12;18)

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । पञ्चस्वपत्सु नारीनाम् पतिर् अन्योविधीयते ॥

নাষ্টে মৃত্যুতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পাতিতে পাটৌ | পঞ্চস্বপতসু নারিনাম পতির অন্য বিদ্যায়তে ||

স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে, মারা গেলে, একজন ত্যাগী (সন্যাসী), নপুংসক হয়ে গেলে, অপমানজনক অপরাধ করে থাকলে, এই পাঁচটি প্রতিকূল অবস্থাতেই নারীদের জন্য পুনর্বিবাহের বিধান রয়েছে। (পরাশর স্মৃতি 4:30)

নারীর পর্দাঃ

নারীর পর্দা নিয়ে ইসলামের নির্দেশনাঃ

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান।

মূলত 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়।

এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।' (সূরা আহযাব: ৫৩)

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি।

বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

‘আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।’ (সূরা আহযাব: ৩৩)

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান।

আল্লাহ তায়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اِذَا سَاَلۡتُمُوۡهُنَّ مَتَاعًا فَسۡـَٔلُوۡهُنَّ مِنۡ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِکُمۡ اَطۡهَرُ لِقُلُوۡبِکُمۡ وَ قُلُوۡبِهِنَّ

‘যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ’। (সূরা আহযাব: ৫৩)

এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ وَّ لَا مُؤۡمِنَۃٍ اِذَا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗۤ اَمۡرًا اَنۡ یَّکُوۡنَ لَهُمُ الۡخِیَرَۃُ مِنۡ اَمۡرِهِمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِیۡنًا ﴿۳۶﴾

‘আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মু’মিন পুরুষ কিংবা কোনো মু’মিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।’ (সূরা আহযাব: ৩৬)

পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ قُلۡ لِّاَزۡوَاجِکَ وَ بَنٰتِکَ وَ نِسَآءِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ یُدۡنِیۡنَ عَلَیۡهِنَّ مِنۡ جَلَابِیۡبِهِنَّ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَنۡ یُّعۡرَفۡنَ فَلَا یُؤۡذَیۡنَ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۵۹﴾

'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে তাদের দেখা যাবে)। এক. এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, আর সেই চাবুক দিয়ে তারা (অন্যায়ভাবে) মানুষকে প্রহার করবে।

দুই. এমন নারী, যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন। তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়। (মুসলিম: ৫৪৪৫)

এ হাদীসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

এ বিষয়টি অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক. পিতা-মাতার অবাধ্যকারী। দুই. দাইয়ুস (অর্থাৎ এমন পুরুষ, যে তার অধীনস্ত নারীদেরকে পর্দায় রাখে না)। তিন. পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করা নারী (অর্থাৎ বেপর্দা নারী)। (মুসতাদরাকুল হাকিম: ২৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নারী তার পালনকর্তার সর্বাদিক নিকটে তখনই থাকে যখন সে তার গৃহে অবস্থান করে। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৫৯৯)

তাই মু'মিন নারীদের উচিত গৃহাভ্যন্তরে এমনভাবে অবস্থান করা যাতে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের দৃষ্টিতে সে না পড়ে। আর এভাবে গৃহে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দার যথার্থতা অর্জিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন তোমরা তাদের (নবী পত্মীদের) কাছে কিছু চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সূরা আহযাব: ৫৩)

এ আয়াতে বিশেষভাবে নবী-পত্মীদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

এ বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিবে।

এ নির্দেশনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহুর্তেও গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষ, নিকটাত্মীয় হোক বা দূরাত্মীয় সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে।

তবে প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলবে। আর পরপুরুষরাও পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতে হবে। এতে পর্দার অপরিহার্যতা পরিস্ফূটিত হয়।

আয়াতের শেষাংশে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পর্দার এ বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পুণ্যাত্মা পত্মীদেরকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন।

অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে করীম (সা.) এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।

(তাহলে বলুন তো) আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্মীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না! (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৭/১৯৫)

বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও প্রতিভাত হয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা নবীপত্মীরা সাধারণত তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দা পালন করতেন। আল্লাহ তায়ালা মু'মিন নারীদেরকেও অনুরূপভাবে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (হে নবী) মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্ত্বে) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষকে আবৃত করে রাখে।

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪
وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজ্জসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা নূর: ৩১)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ, তারা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। তখন এক আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। (বুখারী: ৫২৩২)

আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত 'হামউ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর নিকটাত্মীয়। শব্দটির উদ্দেশ্য ব্যাপক। শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর যেকোনো দিকের ভাই, চাচা, মামা, খালু, ফুফা এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সন্তান। যেমন: দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান ইত্যাদি।

ইমাম তিরমিযী, লাইস ইবনু সা'দ, আল্লামা কাযী ইয়ায ও তাবারী সহ বহু আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য তার দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর ও তাদের ছেলেদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে যেভাবে মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে চায়।

আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহুর্তে মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবে। অর্থাৎ নারীরা এমনভাবে গৃহে অবস্থান করবে যাতে নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষের নজরে সে না পড়ে। গৃহে অবস্থানকালীন মুহুর্তে এভাবে পর্দাবৃত থাকা নারীর জন্য অপরিহার্য।

বাইরে গমনকালীন পর্দা: বলা বাহুল্য যে, নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (বুখারী: ৪৭৯৫)

মূলত ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মানব প্রয়োজনের সকল দিকই ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পর্দাবৃত হয়েই বাইরে বের হতে হবে। কিছুতেই পর্দাহীনভাবে বের হওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু, যখনই সে পর্দাহীনভাবে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকায়। (তিরমিযী: ১১৭৩)

আর পবিত্র কোরআনে নারীদেরকে বাইরে গমনকালীন মুহুর্তে পূর্ণ পর্দা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন (প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়) তাদের (পরিহিত) জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

এ আয়াতে নারীদেরকে বাইরে গমনের সময় তাদের পরিহিত জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক- জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির উপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা বোরকা নামে পরিচিত।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইরে গমনের সময় বোরকা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়া। যা সাহাবী, তাবেয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসীর থেকে প্রতিভাত হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াতে) মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা যখন বাইরে যাবে তখন

তারা যেন জিলবাব দিয়ে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) তাদের মাথার উপর দিক থেকে তাদের মুখমণ্ডলও আবৃত করে নেয়। তবে তারা (চলাফেরার সুবিধার্থে) একটি চোখ খোলা রাখবে। (ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২)

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, আমি আবীদাহ সালামানীহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যে, এ আয়াতে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরবর্তী মুফাসসিরদের ব্যাখ্যার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর, বায়যাবী, বাগভী, নাসাফী, সুয়ূতি, আবু বকর জাসসাস, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ সব তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

অর্থাৎ **সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে নারীদেরকে তাদের চেহারাসহ আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বাইরে গমনকালীন পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।**

আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, কোনো প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যেতে হলে তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে চেহারাসহ গোটা দেহ আবৃত করে পূর্ণ পর্দার সঙ্গে বের হওয়া। যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয।

এক্ষেত্রে জিলবাব বা বোরকা পরিধানের মাধ্যমে আপাদমস্তক আবৃত করে নিবে। প্রয়োজনে চেহারা বা মুখমণ্ডলের জন্য আলাদা নিকাব ব্যবহার করবে। আর হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালীর জন্য মোজা পরিধান করবে। তবে চলাফেরার সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখবে।

বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা: বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা গ্রহণেন অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতিশয় বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা নূর: ৬০)

আয়াতের নির্দেশনা হল, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। গায়রে মাহরাম ব্যক্তিও তার কাছে মাহরামমের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়। বৃদ্ধা নারীদের জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত করা জরুরী নয়।

এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, মাহরাম পুরুষদের সামনে যেসব অঙ্গ খুলতে পারবে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৬/৪৩৯)

এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যেসকল নারী বিবাহের উপযুক্ত নয় এবং যাদের প্রতি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীর জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সঙ্গে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের।

সুতরাং তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই তাদের জন্য উত্তম। (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন: ২/৪৬৮)

হিন্দু ধর্মে নারীর পর্দাঃ

হিন্দুরা মনে করে তাদের ধর্মগ্রন্থে নারীদের পর্দার কথা বলা নেই। আসলে এটা তাদের ভুল ধারণা, কারন হিন্দুদের বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখেনা।
হিন্দু ধর্মে পর্দার বিধান:
ইতিহাস বলে- হিন্দু সভ্যতার সময় হিন্দু মহিলাগণও পর্দা করেছে। বর্তমান হিন্দু মহিলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘোমটা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত -
ঋগে¦দে আছে, "হে নারী! তুই নীচে দৃষ্টি রাখ, ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিস না। আপন পদযুগল একত্রে মিলিয়া রাখ্। তোর নাক যেন কেউ দেখতে না পায়, যদি এমনি লজ্জাবতী হতে পারিস, তাহলে নারী হয়েও তুই সম্মানের পাত্রী হতে পারবি"।
"মহিলারা পুরুষদের মতো পোশাক পরিধান করবে না এবং পুরুষরাও তাদের স্ত্রীদের পোশাক পরিধান করবে না।" (ঋগে¦দ গ্রন্থ নং ১০ - অনুচ্ছেদ ৮৫ - পরিচ্ছেদ - ৩০)
হিন্দু ধর্মে নারীদের জীবন বিধান ও পর্দা যে কত কঠোর তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দুদের পবিত্র সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতায়-
১. "কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা কোন স্ত্রীলোকেরই নিজ গৃহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য করা উচিত নয়।" (স্ত্রী ধর্ম: ১৪৭)
২. "স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর দেহান্ত হইলে পুত্রদিগের বশে থাকিবে।" (স্ত্রী ধর্ম: ১৪৭)
৩. "স্ত্রীলোকগণ পিতা, স্বামী, পুত্রগণ হইতে বিভিন্ন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। যেহেতু স্ত্রী লোকেরা ইহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকিলে অকার্যানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃকুলও শ্বশুরকুল কলঙ্কিত করিতে পারে।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৪৯)
৪. "স্ত্রী, পতির দেহান্ত হইলে পবিত্র পুষ্প, ফল মূলাদি দ্বারা, স্বল্প আহার দ্বারা, ইচ্ছাক্রমে নিজ দেহ ক্ষীণ করিবে, পর-পুরুষের নাম পর্যন্তমনে গ্রহণ করিবে না।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৫৭)

৫. "পতি নিদ্রিত হইলে, মনে মনে পতিকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার পার্শ্বে নিদ্রা যাইবে। সেই সময় বিবস্ত্রা হইবে না, সতর্ক হইয়া শয়ন করিবে, অন্য কামনা-শূন্য (ঝবী) জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৫৭)

(স্ত্রীগণ পর-পরুষের সাথে তো দূরের কথা, নিজ স্বামীর সামনেও বিবস্ত্রা হইতে পারিবে না।)

'হিন্দু মনীষীদের উপদেশাবলী' গ্রন্থের কয়েকটি উপদেশ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

১. ওহে কুমারী সকল, তোমরা নিজেদেরকে বহু পুরুষের ভোগের বস্তুতে পরিণত করিও না।

২. তোমরা তোমাদের ঐ শরীরকে বহু পুরুষের চক্ষু-ইন্দ্রিয় হইতে সর্বদা আগলিয়া রখিবে।

৩. এমন স্থানে স্নান সমাপ্তি করিও যেখানে কোন পুরুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে না।

পর্দা বিদ্বেষী লেখক মাহমুদ শামসুল হক তার 'নারী কোষ' বই এর ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন; এক সময় হিন্দু নারীরাও মশারীর ভেতরে বসে গঙ্গাস্নানে যেত। ভারত বর্ষীয় হিন্দু-মুসলিম নারী অসুখেও ডাক্তার দেখাতো ঘেরা টোপের আড়াল থেকে। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে 'অসূর্যস্পর্শ্যা' নামক একটি শাস্ত্রীয় শব্দ চালু আছে। অর্থাৎ সূর্যালোকও নারীদের ছোঁবে না।

মায়ের মর্যাদা নিয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মতামত

ইসলাম মায়ের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেন, 'আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে।

আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো- (সুরা লুকমান : ১৪)।

মা হিসেবে ইসলামে একজন নারীর অবস্থান অকল্পনীয়। ইসলামে বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি। পবিত্র কোরআনে মায়ের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করে মাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ কর।' (সুরা নিসা : ৩৬)। একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার? তিনি বললেন, মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা- (বোখারি-মুসলিম)।

একদিন হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আসসালামী (রা.) রাসুল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জিহাদ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?' জবাবে রাসুল (সা.) বললেন, 'তোমার মা আছেন?' তিনি বললেন, 'আছেন। ' রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো, কেননা তার পায়ের নিচেই জান্নাত। '

ইসলাম ধর্মের মত এতটা নির্দিষ্টতা না থাকলেও সনাতন হিন্দু ধর্মে মায়ের স্থান অনেক উঁচুতে। মনুসংহিতার শ্লোকে আছে: উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যণাং শতং পিতা। সহস্রন্ত্ত পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে। অর্থাৎ, অর্থাৎ, দশজন উপাধ্যায় থেকে একজন আচার্যের গৌরব বেশি। একশত আচার্যের থেকে পিতার গৌরব বেশি এবং সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা সম্মানার্হা। পিতা-মাতার ঋণ সন্তান শত-সহস্র জন্মেও শোধ করতে পারে না। আরও বলা হয়েছে,
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা ।।
(মনুসংহিতা- ২।২৩৩)
অর্থাৎ, মানুষ মাতৃভক্তি দ্বারা এই ভূলোক জয় করতে পারে।

উপসংহারঃ

বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের কথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও দিবসকেন্দ্রিক কর্মসূচিও পালিত হয় অধিকার আদায়ে। অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ নারীর অধিকার হরণে ইসলামকে দায়ী করে থাকেন। অথচ পবিত্র কোরআনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিকার নিশ্চিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নারীর অধিকার রক্ষায় পুরুষকেই নির্দেশনা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।আর মানুষ সামাজিক জীব, অন্যদিকে প্রকৃতির অংশ। তাই মানুষকে জীবন ধারণ, বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় বিধানই মেনে চলতে হবে। প্রাকৃতিক বিধান লঙঘন করলে ধ্বংস অনিবার্য। আর সামাজিক বিধান ভঙ্গ করলে নেমে আসে বিপর্যয়। ইসলাম প্রকৃতির সেই নিয়মকে মেনে নারীকে পরিবারে, সমাজে এক উচ্চ আসনে অভিসিক্ত করেছে। হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু জায়গায় নারীকে প্রকৃত আসনে বসানোর চেষ্টা করা হলেও সামাজিক রীতি,নীতি ও প্রথাগত কারণে তার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১। যাওয়াদ, হাইফা এ. (১৯৯৮)। দ্য রাইটস অব ইসলাম: অ্যান অথেনটিক অ্যাপ্রোচ। লন্ডন, ইংল্যান্ড: পালগ্রেভ ম্যাকমিলান।

২। S Jain (2003), The Right to Family Planning, in Sacred Rights: The Case for Contraception and Abortion in World Religions (Editor: Daniel C. Maguire), Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৫১৬০০১৭, page 134, Quote - "The Atharva Veda confirms... a brahmacharini has better prospects of marriage than a girl who is uneducated"; "The Vedic period.... girls, like boys, are also expected to go through the brahmacharya..."

৩। For source in Sanskrit: Atharva Veda Wikisource, Hymns 11.5[7].1 - 11.5[7].26; For English translation: Stephen N Hay and William Theodore De Bary (1988), Sources of Indian Tradition, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮০৪৬৭৮, pages 18-19

৪। PV Kane, History of Dharmasastra Volume 2.1, 1st Edition, pages 290-295

৫। Ram Chandra Prasad (1997), The Upanayana: The Hindu Ceremonies of the Sacred Thread, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮১২৪০৬, pages 119-131

৬। মোঃ মিজানুর রহমান, ২০১৬। "ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ-একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"। ইসলামী আইন ও বিচার বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৬

৭।http://www.onislam.net/english/ask-about-islam/ethics-and-values/muslim-character/166329-marriage-is-the-prophets-sunnah.html

৮। "Importance of Marriage in Islam"। al-islam.org। সংগ্রহের তারিখ ১০ জুন ২০১৫।

৯।https://bn.wikipedia.org/wiki

১০। বুহলার, জর্জ (1886)। "তৃতীয় অধ্যায়" । মনুর দৃষ্টিকোণ । প্রাচ্যের পবিত্র বই। ভলিউম 25।

১১। Lochtefeld, JG (2001)।দ্য ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম: এ-এম, পি। 427.আইএসবিএন978-0823931798।

১২। কর্মীদের নিবন্ধ। (সেপ্টেম্বর 2011)। হিন্দু বিবাহের আটটি রূপ এবং এর রীতি। ইন্ডিয়া ট্রিবিউন ।

১৩। https://bn.wikipedia.org/wiki/

১৪। https://www.daily-bangladesh.com/religion/162707